কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

আল-গাযালীর নীতি-ভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব: আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে মূল্যায়ন

শায়লা ইসলাম নীপা*

Abstract: This study explores Al-Ghazali's understanding of the limits of human knowledge through the moral lens and evaluates it in the light of the modern western epistemological thoughts. Al-Ghazali questioned the ability of sense-perception and reason to get certain knowledge and ultimately highlighted Divine illumination that leads to certain knowledge. His scepticism about empirical and rational knowledge comes from a deep ethical concern and his epistemology deeply connected with both spiritual and ethical concerns. Al-Ghazali's view about knowledge holds that true knowledge comes in purified soul and it is directed to the path to the Divine. On the other hand, modern western prominent thinkers such as Descartes, Leibniz, Spinoza, Hume, Locke, and Kant have greatly contributed to modern epistemology and focused on truth, belief and justice especially through secular and analytical perspectives. Although, their epistemic thinking has no conflict with moral considerations, but often their approaches keep epistemological discourse separated from moral and spiritual concerns that often makes it value-neutral disposition. This study examines the contrasts between Al-Ghazali's moral-spiritual epistemic approach and modern western value-neutral epistemic approach to offer a new ethical dimension to epistemology while modern western epistemology lacks it. Integrating Al-Ghazali's ethics-based epistemology and the rigid modern epistemological understanding, it is possible to develop a new epistemological framework that may assist to identify human epistemic limits and enrich cognition.

ভূমিকা

দর্শনের যে সকল মৌলিক জিজ্ঞাসাসমূহ রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা। এ আলোচনা নতুন কোনো সংযোজন নয় বরং এর ইতিহাস অনেক পুরোনো। তবে জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা কখনো সরলরৈখিক ছিল না, কখনো হয়েছে যুক্তিবাদী কাঠামোতে, কখনো অভিজ্ঞতার আলোকে, অথবা কখনো এর সাথে জড়িত ছিল আধ্যাত্মিকতা কিংবা কখনো নিরেট প্রজ্ঞা। জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন প্রখ্যাত একজন ইসলামি চিন্তাবিদ হলেন আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে তিনি জ্ঞানের উৎস, সীমা এবং এর নৈতিক ভিত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত *আল-মুনকিয্ মিন আল-দালাল (Al-Munqidh Min al-Dalal)* গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের বিষয়ে তাঁর সংশয়, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার ভূমিকা, জ্ঞানানুসন্ধান, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর দর্শনকে একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে তিনি পূর্ববর্তী যে সকল চিন্তাবিদ রয়েছেন তাঁদের মতবাদসমূহ

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

আলোচনা করে সেখানে সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে তাদের আলোচনার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞানকে সত্য জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আবার আমরা যদি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের দিকে তাকাই সেখানেও আমরা সরল কোনো চিত্র দেখতে পাই না বরং সেখানে একই সাথে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, প্রাধিকারবাদ এবং স্বজ্ঞাবাদের একটা সংমিশ্রণ দেখতে পাই। জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় এবং এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়েও আলোচনার ক্ষেত্রসমূহ সেখানে রয়েছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেটা আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের আলোকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা। এ আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হচ্ছে সেই সাথে এটিকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে কীভাবে পুনঃ বিশ্লেষণ করা যায় সে বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। আবার একই সাথে বর্তমানে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা ও নৈতিক দায়িত্ব কীভাবে কাজ করতে পারে সেটা আল-গাযালীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব এবং শিক্ষাসংক্রান্ত ভাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের স্থান, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার এক সংমিশ্রণ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের সাথে একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

আল-গাজালির দৃষ্টিতে জ্ঞান

জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা বহুদিনের। জ্ঞান কী, নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব কিনা, এবং জ্ঞান হতে কী কী শর্ত প্রয়োজন– এগুলোর আলোচনা প্রাচীন গ্রিস থেকে শুরু হয়। আধুনিক দর্শনে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত জ্ঞানের সংজ্ঞা যা Edmund L. Gettier এর *Is Justified True Belief Knowledge?* প্রবন্ধে আমরা পাই, Knowledge is justified true belief (JTB) অর্থাৎ জ্ঞান হলো যুক্তিসঙ্গত সত্য বিশ্বাস (Gettier 1963)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞায়নে গেটিয়ারের নাম বারবার উঠে আসলেও এর ধারণা প্রোথিত ছিলো প্লেটোর *থিয়েটেটাস (Theatetus)* গ্রন্থে (201c–210b)। প্লেটোর কাছে জ্ঞান হলো, "Justified true belief plus logos" (Cooper 1990, p. 243)। তিনি জ্ঞানকে বলেছেন সত্য বিশ্বাস (True Belief), আবার এর সাথে যুক্ত করেছেন লোগস (Logos) অর্থাৎ যুক্তি বা বিচার বিশ্লেষণ। এদিক থেকে বলা যায় তাঁর কাছে জ্ঞান হচ্ছে যা একই সাথে সত্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য গেটিয়ার তাঁর প্রবন্ধে জ্ঞানের এই প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞায়নকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং বলেছেন শুধুমাত্র এই তিনটা শর্তই নিশ্চিত জ্ঞানের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ সেখানে কাকতালীয়তা ঢুকে যেতে পারে। বরং এর সাথে আরো কিছু শর্ত যুক্ত হতে পারে। এখানে গেটিয়ার জ্ঞান হিসেবে বুদ্ধিভিত্তিক যাচাইকরণকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বলে মনে করছেন না। তাঁর মতে,

> "…, it is possible for a person to be justified in believing a proposition that is in fact" (Gettier 1963,121).

ঠিক একইরকম ভাবে না হলেও আল-গাযালী নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতা ও যুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যুক্তির মাধ্যমেই আমরা অর্জন করতে পারি না বরং এর একটা গভীর আত্মিক মানদন্ড রয়েছে। তাঁর *আল-মুনকিয্ মিন আল-দালাল* গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যুবক বয়সে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের সাথে পরিচিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন ঘটনার কারণে তাঁর সত্যের

প্রতি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব হয়। এজন্যই তিনি একসময় নিশ্চিত সত্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। নিশ্চিত জ্ঞানকে তিনি সংজ্ঞায়ন করেছেন এইভাবে,

> "That in which the thing known is made so manifest that no doubt clings to it, nor is it accompanied by the possibility of error and deception, nor can the mind even suppose to such a possibility" (Al-Ghazali 1980, p.3).

অর্থাৎ সেটিই প্রকৃত জ্ঞান, যাতে বস্তুর স্বরূপ এত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে তাতে কোনো সন্দেহ জড়িত থাকে না, এবং যা ভ্রান্তি বা প্রতারণার কোনো সম্ভাবনা নিয়ে আসে না; এমনকি মানসিকভাবে তেমন কোনো সম্ভাবনাও কল্পনা করা যায় না। এমন জ্ঞান যার বিষয়বস্তু এমনভাবে উপলব্ধি হয় যা কোনোভাবে সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

এভাবে তিনি দেখলেন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির ব্যবহার হয়ে থাকে। তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হলো, এগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য? এছাড়াও তিনি প্রশ্ন করলেন, আমরা যে বাস্তবিক জগৎ দেখছি সেটা কি সত্যি নাকি স্বপ্ন? সকল প্রশ্ন তাঁকে এক ধরনের সংশয়বাদের দিকে ধাবিত করে। পরবর্তীতে এই সংশয় থেকে উত্তরণের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের রাজ্যে বিশাল অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর এ সংক্রান্ত চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। আর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা যায় শুধুমাত্র আক্‌ল (Aql) বা বুদ্ধির (Intellect) মাধ্যমে। তাঁর কাছে আক্‌লকে আমরা ভিন্নভাবে জানতে পারি যা প্রচলিত বুদ্ধি (reason) অর্থে ব্যবহৃত হয় না, তাঁর কাছে আক্‌ল হলো যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, pp. 95-96)।

মুসলিম চিন্তাবিদ আল-গাযালী 'আক্‌ল' বা বুদ্ধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আক্‌ল হচ্ছে সেই বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে বস্তুজগতের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা যায় এবং এর কেন্দ্র্ হলো আত্মা এবং পাশাপাশি তিনি এটিকে এমন এক জ্ঞানীয় শক্তি হিসেবে দেখেছেন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শাস্ত্রের গভীরতম রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, p. 9)। আল-গাযালীর মতে, আক্‌ল শুধু যুক্তি বিশ্লেষণের মাধ্যম নয়, বরং আত্মিক উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকেও পরিচালিত করে। তাঁর গ্রন্থে তিনি বলেন আল্লাহ সর্বপ্রথম আকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞানকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এই আক্‌ল(Al-Ghazali, 1993, Vol. 3, p. 9)। আত্মায় আবির্ভূত হয় এরকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন : ১) প্রাকৃতিক জ্ঞান ও ২) অর্জিত জ্ঞান। আবার এই অর্জিত জ্ঞান দুই ধরনের : পার্থিব জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, 96) ।

আল-গাযালীর মতে, ''বুদ্ধি সম্পর্কিত জ্ঞান হলো মৌলিক, প্রাকৃতিক ও অপরিহার্য জ্ঞান" (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, p. 20)। অর্থাৎ আল-গাযালীর আক্‌লের জ্ঞানকে মৌলিক, স্বভাবগত এবং অনিবার্য জ্ঞান বলেছেন। স্বাভাবিক এবং অনিবার্য জ্ঞান বলতে অনেকটাই কান্টের অভিজ্ঞতা-পূর্ব কিংবা ডেকার্তের সহজাত ধারণার ন্যায় যেখানে এটা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে এবং সে কোথা থেকে পেয়েছে সেটা সে নিজেও জানে না। যেমন এটা হতে পারে কোন একটা বাচ্চা যে জটিল নিয়ম কানুন এখনো জানেনা কিন্তু তাকে যদি কেউ বলে তার মা একই সাথে তার কাছে আছে এবং অন্য একটি জায়গায় আছে তখন সে সেটা বিশ্বাস করবে না, তার কারণ এটাই মৌলিক সত্য বা প্রাকৃতিক জ্ঞান। আবার অর্জিত জ্ঞান শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয় (Al-Ghazali 1993 Vol. 3, p. 20), অর্থাৎ, এটা এমন এক ধরনের জ্ঞান যেখানে শিক্ষার প্রভাব রয়েছে, অভিজ্ঞতা-পূর্ব নয়।

আবার আল-গাযালী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আত্মার দুটি দরজার কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি বলছেন আত্মার একটি দরজা খোলা থাকে আধ্যাত্মিক জগতের জন্য যেটা ফেরেশতাদের লাউহে মাহফুজের[৫] জগত, এবং আরেকটা দরজা রয়েছে যেটি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পার্থিব বস্তু জগতের সাথে সম্পৃক্ত। এখানেই নবী-রাসূল ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের জ্ঞানের পার্থক্য হয় (Al-Ghazali 1993 Vol. 3, p. 26)। আল-গাযালী মনে করেন নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার জন্য জ্ঞানের যে উৎসসমূহ আছে সেগুলোর পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এ কারণে যাঁরা সত্য অনুসন্ধান করে তাঁদের মতবাদের পর্যালোচনা করেন এবং সত্যানুসন্ধানে কতোটা কার্যকরী সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

আল-গাযালী নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে আত্মার যোগাযোগ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রধান গ্রন্থ *ইহ্ইয়া উলুম আল-দীনে* বলতে চেয়েছেন, মানুষের আত্মাই হলো এমন সত্তা যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে এবং এই আত্মা দিয়ে মানুষ কেবল আল্লাহ ও তাঁর গুণ সম্পর্কে জানতে পারে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নয় (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, p. 7)। এ কারণে মানুষের আত্মাকে জানাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ নিজের আত্মাকে না জানলে কখনোই সে আল্লাহকে জানতে পারবে না। আল-গাযালীর মতে সত্য জ্ঞান তাই হবে যা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। এখানে ইমাম আল-গাযালীর কাছে কুরআন ও হাদিস অনুসরণে এক গভীর তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা পাই, যেখানে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন সৃষ্টির শুরুতে মানুষ এক ধরনের অজ্ঞতায় বা অন্ধকারে থাকে পরবর্তীতে আল্লাহর নূরের মাধ্যমে সবার জীবন আলোকিত ও অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে (Al-Ghazali 1924, p. 96)।

আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব

আল-গাযালীর প্রারম্ভিক জীবন অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় তিনি ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন তবে তার যুবক বয়সে নিশ্চিত সন্ধান করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানের প্রচলিত যে উৎসসমূহ রয়েছে সেগুলোকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। পরবর্তীতে তিনি জ্ঞানের উৎসসমূহকে পর্যালোচনা শুরু করলেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও পয়গম্বরদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান মিলিত হলেই একজন মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে নৈতিক জীবন গঠন করা সম্ভব হয় (Al-Ghazali 1980, pp. 4-7)। তাঁর কাছে আমরা জ্ঞান কীভাবে নৈতিক জীবনে ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে সেটা দেখতে পাই। তাঁর আলোকে জ্ঞানের উৎসসমূহ,

Sense-Experience (ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা) ← প্রাথমিক জ্ঞান

Reason (যুক্তি/বুদ্ধি) ← বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান

Authority (প্রাধিকার)←বিশ্বস্ত সূত্র

Revelation and Intuition (প্রত্যাদেশ ও স্বজ্ঞা) ← আধ্যাত্মিক জ্ঞান

Source: Mustafa, K. (2003). *Al-Ghazali's theory of knowledge* (1st ed.). Dhaka: Ramon Publishers.

[৫] লাওহে মহফুজ হলো ঈশ্বরের কাছে থাকা আধ্যাত্মিক “গার্ডেড ট্যাবলেট”, যেখানে সমস্ত ঘটনার পূর্বলিখিত রেকর্ড আছে, যা আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ আত্মার মিররে প্রতিফলিত হতে পাওে (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, p. 23) ।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (Sense-Experience)

আল-গাযালী বুদ্ধিবাদীদের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অপারগতার কথা প্রকাশ করেননি। তিনি বলেন, আত্মা একই সাথে অতিন্দ্রিয় জগত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত দুইয়ের সাথেই যুক্ত। এ প্রসঙ্গে বলেন, "আত্মার একটি দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে, যা হলো ফেরেশতাদের জগত এবং সুরক্ষিত ফলক; আর আত্মার আরেকটি দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দিকে, যা বস্তুজগতের সাথে যুক্ত " (Al-Ghazali 1993,vol.3, p.26)। তাঁর মতে, আত্মার একটি দ্বার আধ্যাত্মিক জগতের দিকে খোলা এবং এতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনো প্রয়োজন নেই এবং শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণ আল্লাহর প্রদত্ত ঐশী ক্ষমতায় সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। অন্যদিকে, আত্মার দ্বিতীয় দ্বার ইন্দ্রিয়জগতের দিকে খোলা যা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন (Al-Ghazali 1993,vol.3, pp.26-27)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকে আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও এটা ভুল ধারণা দিতে পারে। তাঁর মতে,

> "Sight also looks at a star and sees it as something small, the size of a dinar: then geometrical proofs demonstrate that it surpasses the earth in size" (Al-Ghazali 1980, pp. 4-7).

অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিও একটি তারা দেখে এবং সেটিকে ছোট একটি দিনারের সমান আকার মনে করে; তারপর গাণিতিক প্রমাণগুলি দেখায় যে, এটা আকারে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যায়। যেমন দূর থেকে চাঁদকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয় কিন্তু তা সঠিক নয়। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন অনেক সময় আমরা যা দেখি সেটা পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের নৈতিকতা নিয়েও বেশ প্রশ্ন ওঠে। আল-গাযালী এ সীমাবদ্ধতার জন্যই একে সত্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং সেই সীমার বাইরে গিয়ে সত্য ও গভীরতম উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের দ্বারা আমরা কেবল বাহিরের আচরণ ও নিয়ম-কানুন পরিলক্ষিত করি এবং তা থেকে আমরা জ্ঞান অর্জন করি এবং আমরা পরবর্তীতে সেগুলো প্রয়োগ করে থাকি। যদিও এ জ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতে বিশুদ্ধতা থাকে না। কারণ আমরা প্রায়ই দেখি যা আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আহরণ করি তা ভুল হতে পারে। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। চোখ অনেক সময় ভুল দেখতে পারে সেটা হতে পারে কোন অসুস্থতা, আলোর ঘাটতি, অন্যমনস্কতা কিংবা স্নায়ুতন্ত্রের কোন চাপের কারণে, আবার অনেক সময় আমরা অসুস্থ হলে ঘ্রাণশক্তিতে সমস্যা হয় এবং কখনো বা আমাদের শোনার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি থাকতে পারে। তাই এই জ্ঞানকে পুরোপুরি নিশ্চিত বলা যায় না।

বুদ্ধি (Reason)

আরেকটা বহুল প্রচলিত জ্ঞানের উৎস হলো বুদ্ধি। আল-গাযালীর কাছে যে আক্ল বা বুদ্ধির ধারণা পাওয়া যায়, তা অনেকটাই বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বুদ্ধি বা যৌক্তিকতার ধারণার ন্যায় (Mustafa 2003, 46)। এটা সাধারণত যুক্তিপ্রদান ও বিশ্লেষণী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন আমরা গাণিতিক কোন ধারণাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তি বা বুদ্ধির ব্যবহার করে থাকি। এটা একটা উচ্চতর মাধ্যম যা আল-গাযালীও স্বীকার করেন। তাঁর মতে,

> Perhaps, I can rely only on those rational data which belong to the category of primary truths, such as our asserting that 'Ten is more than three,'… (Al-Ghazali 1980, p.4).

অর্থাৎ, হয়তো আমি শুধুমাত্র সেই যৌক্তিক তথ্যগুলোর উপর নির্ভর করতে পারি, যেগুলো প্রাথমিক সত্যের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত, যেমন আমরা দাবি করি যে দশ তিনের চেয়ে বেশি।

এখানে আল-গাযালী বুদ্ধির সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছুটা ভরসা করেছেন যে কিছু মৌলিক সত্য সকলের কাছে প্রমাণিত যেমন গণনা ও পরিমাপসংক্রান্ত বিষয়সমূহ সেগুলো আমরা বুদ্ধির মাধ্যমে পাই। তিনি বলেছেন, এটিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে হলেও নিশ্চিত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি ধরা পড়েছে বুদ্ধির বিচারে। বুদ্ধির চেয়ে এমনও এক উচ্চতর কিছু থাকতে পারে যার বিচারে বুদ্ধি ভ্রমাত্মক বলে প্রমাণিত হবে" (আমিনুল ইসলাম ২০১৯,পৃ.২০৫)। অর্থাৎ বুদ্ধি সর্বোচ্চ মানদন্ড হতে পারে না, কারণ বুদ্ধি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানও যাচাইয়ের অপেক্ষা রাখে। জ্ঞানের রাজ্যে প্রায়ই নতুন কোন বৌদ্ধিক জ্ঞান এসে পুরাতনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। তবে যা নিশ্চিতভাবেই সত্য তাকে কখনোই প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না। বুদ্ধি বা যুক্তি সাধারণত আমাদের বাহ্যিক জীবনে যে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলো রয়েছে সেগুলো গ্রহণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ব্যক্তির আচরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সবাই নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে এবং বাস্তবিক সমস্যা সমাধান করতে চায় এক্ষেত্রে বুদ্ধি বা যুক্তির মধ্যে একটা আপেক্ষিকতা থাকে, আর যেখানে আপেক্ষিকতা থাকে সেখানে নৈতিকতার বিষয়টিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বুদ্ধিকে তিনি একেবারেই অযৌক্তিক বলেননি কিন্তু বলেছেন এটা সর্বোচ্চ শক্তি বা সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে নিয়ম কানুনকে ব্যাখ্যা করা গেলেও সেটি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন আনতে পারে না। তাই দেখা যায় অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও অনৈতিক জীবন যাপন করে থাকে।

Authority বা প্রাধিকার

আল-গাযালীর মতে, যুক্তি বা অভিজ্ঞতার প্রাথমিক যাচাই ছাড়াও কুরআন ও হাদীসের উপর নির্ভর করা উচিত, কারণ এগুলো এমন এক কর্তৃত্বপূর্ণ উৎস যা মানুষের আত্মা ও চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাঁর মতে, ''প্রাচীনকালে পরম করুণাময় ও প্রশংসনীয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে, তাঁর নবীর মাধ্যমে, একটি বিশ্বাস বা ধর্মীয় নীতি পৌঁছে দিয়েছিলেন, যা তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের জন্য সত্য এবং নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে" (Al-Ghazali 1980, p. 6)। অর্থাৎ, এই প্রাধিকারের জ্ঞান নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে এসেছে। এখানে কোরআন,হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে যা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কোনটির সাহায্যে যাচাই করা যায় না, সেসকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসের সাহায্য নিতে হয়। আমরা ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি আবার অনেকে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকেও বিশ্বাস করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের এই দুটো রাজ্য কাজ করে না। তাই এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ সে সকল ক্ষেত্রে প্রামাণ্য সূত্রগুলো একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে বলে এগুলো অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ের। এখানে নবী ও রাসূলগণের যে জীবনভিত্তিক শিক্ষা সেটার মাধ্যমে অনেক মানুষ জীবনযাপন করতে পারে কিন্তু তাও এটা মাধ্যম হয়ে আসে তাই এটা গ্রহণ করার ক্ষমতা একেকজনের একেক রকম। আবার তিনি এটা মনে করেন যুক্তির থেকে প্রাধিকার বা কোরআন ও হাদিস নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য কারণ যুক্তিকে পরিচালিত করতে গেলেও প্রামাণ্য সূত্রের প্রয়োজন হয়। তবে নবী-রাসূলগণের কাছে ওয়াহি আসার পথ যেহেতু বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে অবস্থায় মানুষ কীভাবে চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান করতে পারে সেই দিকে তিনি অনুসন্ধান চালান।

প্রত্যাদেশ ও স্বজ্ঞা (Revelation and Intuition)

আল-গাযালী এমন একটি জ্ঞানের উৎসের সন্ধান করেন যাতে কোনো ধরনের ভ্রান্তি ও প্রতারণা নেই বরং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এক ধরনের জ্ঞান। তাঁর মতে, কিছু জ্ঞান আছে যা অর্জিত নয় তথা যা হঠাৎ করেই মনে আবির্ভূত হয়। এরমধ্যে প্রথম ধরনের জ্ঞান ফেরেশতার মাধ্যমে আত্মার মধ্যে প্রেরিত হয়। এটাকেই তিনি ওহী বা ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান (Revelation) বলছেন, যা শুধুমাত্র নবীদের কাছে প্রকাশিত হয় (Al-Ghazali 1993, vol. 3, p.23)। আরেক ধরনের জ্ঞান কোথা থেকে আসে বা কিভাবে আসে তা জানা যায় না। তিনি বলেন, সূফীরা এই ধরনের জ্ঞান তথা ইলহাম বা আধ্যাত্মিক প্রেরণা (Inspiration or Intuition) অর্জন করতে সক্ষম, যার কারণে তাঁরা বই পড়ে বা যুক্তি দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে না (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, pp.23-24)। এক্ষেত্রে বলা যায়, "যে জ্ঞান ওহী থেকে প্রাপ্ত, তাকে 'নবীজ্ঞান' বলা হয়, এবং যে জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি থেকে প্রাপ্ত, তাকে বলা হয় 'উচ্চতর উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান', আল-ইল্মুল লাদুনিয়্যাহ" (Mustafa 2003, 55)। আল-গাযালী তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে বেশ কিছু সময় সত্য জ্ঞানের উৎস নিয়ে সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর এই তৃষ্ণা নিবৃত্ত করে একটা আধ্যাত্মিক আলো (Devine light) (আমিনুল ইসলাম ২০১৯,পৃ.২০৫)। তিনি পরম সত্যের সন্ধান পেলেন, সত্য নিয়ে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না, আর সেটা তিনি বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা কিংবা কোনো ধর্মীয় ইমামের কাছ থেকে পাননি, বরং এটা এমন এক ধরনের দৈবিক আলো যা আল্লাহ তা'আলা থেকে সরাসরি তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এখানে কোন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা হয় না বলে বিকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখানে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাশ্‌ফ বা স্বজ্ঞার কথা বলেন যেটা সাধারণত সূফী সাধকরা ব্যবহার করে। কাশ্‌ফ বা স্বজ্ঞা এক ধরনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যার মাধ্যমে পরম সত্য উন্মোচিত হয়। সূফীরা আধ্যাত্মিক সাধনার এক পর্যায়ে কাশফের মাধ্যমে পরমসত্তার সাথে একাত্মতা লাভ করে। এই অংশে আল-গাযালী আলোচনায় সূফীদের এই অনুশীলনটাই পরিলক্ষিত হয়। তিনি এই ধরনের জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে। তিনি এর প্রকৃতি ব্যাখ্যায় বলেছেন এ জ্ঞান পাওয়ার জন্য আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন যার মাধ্যমে হৃদয় আলোকিত হয় এবং আমরা সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞানে পৌঁছাতে পারি। এটাকে তিনি এক ধরনের দৈবিক আলো বলে স্বীকার করেছেন। এখানে নৈতিকতার সর্বোচ্চ ধাপ পরিলক্ষিত হয় যেখানে কোনো ধরনের অবিশুদ্ধতা নেই। ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান তথা কাশ্‌ফ বা ইলহামে পৌঁছায়। আল-গাযালীর মতে সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ তখনই হয়ে ওঠে যখন আধ্যাত্মিক আলোর মধ্যে সে ভালো মন্দকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে এবং এটা তার হৃদয়ঙ্গনে বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে আসে।

সূফীরা নিশ্চিত জ্ঞান বলতে ঐশ্বরিক অনুভূতিটাকে ইঙ্গিত করেছেন যেখানে তাঁরা বিশ্বাস করেন আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে আমরা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয় যেটা আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির মাধ্যমে পাইনা এবং এগুলো নিশ্চিত জ্ঞানের সীমানার বাইরে থাকে। সূফীবাদে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে যাত্রা করা হয় এবং একে তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই বিশেষ জ্ঞানের সাথে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি নির্ভর জ্ঞানের কোনো মিল নেই। এটি এমন এক বিশেষ অভিজ্ঞতা যা মানুষকে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়।

আল-গাযালী উল্লেখ করেন, সূফীরা এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলেন, যেখানে তাঁরা অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সীমানা ছেড়ে এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁদের মতে, এই অভিজ্ঞতাগুলো বাস্তবতার অন্য একটি মাত্রা, যা শুধু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় (Al-Ghazali 1980, p. 4)। আল-গাযালীর মতে, সূফীরা ইলহাম বা আধ্যাত্মিক

প্রেরণাকে জ্ঞানের প্রকৃত উৎস মনে করে বিধায় শিক্ষা বা বই পড়ে বা যুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী নয় (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, pp. 23-24)।

জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও নৈতিকতার স্থান

ইসলামে সর্বদা জ্ঞান অর্জনের দিকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-গাযালীও কুরআন ও হাদিসের আলোকে জ্ঞানের উৎকর্ষতা আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদিস উদ্ধৃত করেন, "পুনরুত্থানের দিনে জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদদের রক্তের সঙ্গে ওজন করা হবে" (Al-Ghazali 1993,vol.1, p.19)। এই কথাটির মাধ্যমে ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মর্যাদা বোঝানো হয়েছে। তিনি মনে করেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান অর্জন করা।

আল-গাযালী জ্ঞানকে একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দেখতে চেয়েছেন যেটা কেবলমাত্র তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ নয় বরং এটা এক ধরনের ঈমানী দায়িত্ব বা নৈতিক স্বাধীনতা হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যা শুধু আমাদের মস্তিষ্ক নয় হৃদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান দিতে গিয়ে তার পূর্ববর্তীতে যারা সত্যের সন্ধান করেছে তাদের আলোচনাকে নিয়ে আসেন। তাঁদের যে সত্য অর্জনের পন্থা সেগুলোর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে চেয়েছেন। আল-গাযালীর কাছে জ্ঞান হচ্ছে এমন কিছু যা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মতে, ''আত্মা একটি আয়নার মতো, যেখানে উপরোক্ত পাপ ও গুণাবলী প্রতিফলিত হয়'' (Al-Ghazali 1993, Vol. 3, p. 9)। অর্থাৎ আত্মা হলো একটি আয়নার মতো, যেখানে উপরে বর্ণিত দোষ-গুণ উভয়ই প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে আলোচনা সুফিবাদের দিকে ইঙ্গিত দেয়। শেষ পর্যন্ত সুফিরা যে জ্ঞানের কথা বলেন সেখানেই তিনি সন্দেহাতীত জ্ঞানের সন্ধান পান। আল্লাহর সাহায্যে আত্মার উপরের অংশ থেকে অন্ধকারে পর্দা দূর হয়ে যায় এবং ঐশ্বরিক বিষয়গুলোর প্রকৃতির সুরক্ষিত তাঁর কাছে প্রকাশিত হয় (Al-Ghazali 1993, vol.3, p. 24)। এখানে আল-গাযালীর কাছে আত্মা হলো প্রকৃত জ্ঞানের ধারক। তিনি বলেছেন, আত্মা, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এবং সেই স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান এই তিনটি একই সূত্রে গাঁথা যেখানে আত্মার মাধ্যমে সেই বস্তুর জ্ঞান অর্জিত হয় (Al-Ghazali 1993, vol.3, p. 16)। এ কারণে জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মার পবিত্রতা জরুরী। তিনি আত্মার পবিত্রতার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব এখানে এসে সরাসরি নৈতিকতার সাথে একীভূত হয়েছে। আল- গাযালীর মতে প্রকৃত জ্ঞান তখনই অর্জিত হয় যখন মানুষ সকল ধরণের পাপ কর্ম থেকে নিজের আত্মাকে মুক্ত রাখে এবং নৈতিকভাবে উন্নতি চরিত্র গঠন করে। আল-গাযালীর জ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা তার তিন জগতের ধারণার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। জাপানি ইসলামিক গবেষক Kojiro Nakamura তাঁর প্রবন্ধে ইমাম আল-গাযালীর তিন জগত সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেন যেখানে আল মুলক বা বস্তুজগত, যা আমরা দেখতে পাই; আল- মালাকুত বা আধ্যাত্মিক জগত, যা জানার জন্য অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন; এবং আল-জাবারুত বা ঈশ্বরের জগত, যা মূলত সবকিছুর বাস্তবতা (Nakamura 1994, p. 31)। আল-গাযালীর মতে, মুলক ও মালাকুত উভয়ই সংযুক্ত এবং এই মুলক মূলত মালাকুতের প্রতিচ্ছবি। এই বাহ্যিক জগতে যা কিছুই আছে সব কিছুই মালাকুতের জগতের প্রতীক, যার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। মানুষ যখন মুলক বা বস্তুজগতে সাধারন বুদ্ধি প্রয়োগ করে তখন সেগুলোকে সত্য বলে ভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তাই এ জগতকে একটা শিক্ষনীয় জায়গায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে ধাবিত হতে হবে (Nakamura 1994, pp. 32-34)। তাঁর এই আলোচনা স্পষ্টতই জ্ঞান অর্জনের সঠিক ক্ষেত্রের দিকে নির্দেশ করে এবং আমাদের নৈতিক দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন, যা জ্ঞানতাত্ত্বিক যুগ বলে পরিচিত সেখানে জ্ঞান কী, আমরা কীভাবে জানি, জ্ঞান অর্জন করতে আমরা কোন ধরনের মাধ্যম আমরা ব্যবহার করি, সেগুলো নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারে কিনা, আমাদের যে বিশ্বাস আছে সেটা কতোটা ন্যায়সঙ্গত– এ বিষয়গুলো সাধারণত সবার প্রশ্নের বিষয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের দার্শনিকরা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের ভিন্ন ভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে মতামতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন বুদ্ধিকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেছেন রেনে ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবনিজ এবং অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন জন লক, হিউম ও বার্কলি প্রমুখ।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব নীতিশাস্ত্র থেকে একেবারেই পৃথক সেটা বলা যায় না। যদিও জ্ঞানের দুইটা শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে নৈতিকতাকে একেবারে এড়িয়ে চলা যায় না। এক্ষেত্রে নৈতিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্বের কিছু সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো জানতে পারাটা অত্যন্ত জরুরী সেটা হচ্ছে আমি জানি কিনা যে এটি ভুল এবং আমার সিদ্ধান্তে যথেষ্ট যৌক্তিক ভিত্তি আছে কিনা। এক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের সাথে নৈতিক বিষয়কে একেবারেই পৃথক করা যায় না। এটাও ঠিক মানুষের নৈতিক বিশ্বাসটি কীভাবে গঠিত হয় এবং এই বিশ্বাসগুলোর ভিত্তি আছে কিনা সেগুলো জানার জন্য জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়।

> This socially situated conception puts questions of social identity and power centre stage, and it is the prerequisite for the revelation of a certain ethical dimension to epistemic life— the dimension of justice and injustice (Fricker 2007, p. vii).

এই সমাজভিত্তিক ধারণাটি সামাজিক পরিচয় ও ক্ষমতার প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে এবং এটি জ্ঞানীয় জীবনের একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মাত্রা - ন্যায় ও অন্যায়ের মাত্রা- প্রকাশের পূর্বশর্ত। ফ্রিকার বলছেন, যথার্থ জ্ঞান অর্জনকে কখনো সমাজ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারিনা। সমাজের কারা কথা বলবে এবং সবার কাছে কতোটা বিবেচিত হবে তা সামাজিক পরিচয় নির্ধারণ করে দেয় কিংবা ক্ষমতার দাপটের দ্বারা। এক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা বিষয়টি ন্যায় নৈতিকতার সাথে জড়িয়ে পড়ে। এখানে স্পষ্টভাবে ফ্রিকার বলছেন, রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যদি জ্ঞানতাত্ত্বিক ন্যায্যতা না থাকে তাহলে সেটা নৈতিক অন্যায় হয়ে যেতে পারে (Fricker 2007, pp.7-8)।

এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, যেগুলোকে নৈতিক সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এগুলোর পেছনে যৌক্তিক বিশ্লেষণ আছে কিনা, অন্যথায় এটি কেবলমাত্র একটি সাধারণ মতামতই হতো। এ বিষয়কে সামনে রেখেই নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বের জন্ম হয়েছে। রবার্ট অডির মতে, নৈতিক জ্ঞান এবং নৈতিক বৈধতা মূলত প্রাথমিক অভিজ্ঞতামূলক ও যৌক্তিক উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত (Audi 1998, p. 261)। অর্থাৎ আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির ভিত্তিতে।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী সেটা হচ্ছে বিশ্বাস করার নৈতিকতা রয়েছে কিনা অর্থাৎ আমরা এমন কোনো কিছু কি বিশ্বাস করি না যার যৌক্তিক ভিত্তি নেই, যেমন আমরা বর্তমানে অনেক ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে দূরে সরে এসেছি সেটার একটাই কারণ সেখানে কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। তাই বলা যায় কোনো বিষয় নৈতিক বিশ্বাস বলে পরিগণিত হতে পারেনা যতক্ষণ না সেখানে যৌক্তিক ভিত্তি থাকে। এবার ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে

যদিও নৈতিকতার বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত না হলেও কিছুটা উপেক্ষিত সেটা বলা যায়। জ্ঞান কী, আমরা কীভাবে জানতে পারি, সত্য ও বিশ্বাসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি নেই এ সকল বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব যতটা গুরুত্ব প্রদান করেছে তার থেকে অনেক কম গুরুত্ব দিয়েছে মানুষ যে নৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ নেয় সেগুলোর ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি কী এবং নৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞান কোনো ভূমিকা পালন করে নাকি করে না সে বিষয়গুলোতে। এখানে এসে জ্ঞান থেকে নৈতিকতা কিছুটা দূরে সরে যায় । নৈতিকতার ভিত্তি তখন জ্ঞান সেটা উচ্চস্বরে বলা যায় কিনা সে ক্ষেত্রে সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে গেটিয়ারের '*জাস্টিফাইড ট্রু বিলিভ*' (যাচাইকৃত বিশ্বাস) পরবর্তীতে যারা উনার বিকল্প মতামত প্রদান করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগই বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্যই করেছেন যেখানে নৈতিকতার প্রেক্ষাপট টানা হয়নি। যেমন সংবাদদাতা যদি কোন ভুল তথ্য নিয়ে আসে এবং সেটাকে যখন যৌক্তিক ভাবে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করে নেওয়া হয় তখন সে ক্ষেত্রে কোন নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা আছে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তেমন দেখা যায় না। যদিও নৈতিক জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে একটা শাখা রয়েছে কিন্তু সেটা খুব বেশি প্রসিদ্ধ হয়নি। এ কারণেই আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে নৈতিকতা, বিশ্বাস ও অনুভূতি এগুলো থেকে অনেক বেশি যে সকল বিষয়গুলোতে পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ রয়েছে সেগুলোই বেশি বিশ্বাস করা হয়েছে এখানে নৈতিক জ্ঞানকে ততটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আবার আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিকগণ সত্য ও বিশ্বাসের যে ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সেখানে নৈতিকতার প্রেক্ষাপট তাঁরা বর্জন করেছে এবং সেটা যৌক্তিক কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু সমাজের থেকে প্রাপ্ত নৈতিক ধারণাসমূহ যে মানুষের জ্ঞান অর্জনের ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়গুলোকে তারা এড়িয়ে গিয়েছেন। এদিক থেকে এটা বলা যায় আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব আমরা কীভাবে জানি এই বিষয়ে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রদান করেছেন ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য কী এবং এক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে আমাদের কোন নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে কিনা।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ট নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যদিও পরবর্তীতে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে তিনি বুদ্ধিকে নিশ্চিত জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করলেন তিনি কিন্তু অন্যান্যদের অস্তিত্বকে গুরুত্ব প্রদান করলেন না এমনকি তিনি তাঁর আত্মাকে সামাজিক বা নৈতিকভাবে সম্পৃক্ত কোন বিষয় হিসেবেও সেখানে উপস্থাপন করেননি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি,

> "I think, therefore I am (COGITO ERGO SUM), was so certain and of such evidence that no ground of doubt" (Descartes 2008, p.30).

এক্ষেত্রে তাঁর কাছে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা নিছক বৌদ্ধিক এক অনুশীলন। এই বাক্যটি আত্মসচেতনতার মৌলিক ভিত্তিকে চিহ্নিত করে। বেনেডিক্ট স্পিনোজার *এথিক্স (Ethics)* গ্রন্থের ২য় খন্ডে, নৈতিকতা ও জ্ঞানার্জন নিয়ে বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস বলেন যা আত্মা সংশ্লিষ্ট। স্পিনোজা জ্ঞানকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন তার মধ্যে কল্পনা থেকে আসে অস্পষ্ট জ্ঞান, যুক্তি বা বুদ্ধি থেকে স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত ধারণা এবং সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান হলো অন্তর্দৃষ্টিজনিত ধারণা,যার মাধ্যমে ঈশ্বরের গুণাবলী ও বস্তুর প্রকৃত রূপ জানতে পারা যায় (Thilly 1982, p. 329), তাঁর এই ধারণার সাথে আল-গাযালীর ধারণা মিল পাওয়া যায় যেখানে তিনিও জ্ঞানার্জনে অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞানের কথা বলেন। স্পিনোজার মতে, ''মনের সর্বোচ্চ মঙ্গল হলো আল্লাহ্‌র জ্ঞান, আর মনের সর্বোচ্চ গুণ হলো আল্লাহ্‌কে জানা" (Thilly 1982, p. 330)। একইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-গাযালীর ন্যায় ঈশ্বরের জ্ঞান কে সর্বোচ্চ জ্ঞান বলেন তবে এটাও ঠিক তাঁর ও গাযালীর ঈশ্বর এক নয়, তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃতি হিসেবে দেখেন এবং যুক্তি দ্বারা আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করাই প্রকৃত সুখ বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে স্পিনোজার আলোচনা এতটাই বুদ্ধি ভিত্তিক রূপ লাভ করে যে একপর্যায়ে মানুষের স্বতন্ত্র

ইচ্ছাকেও স্বীকার না করে ঈশ্বরের বা সর্বজনীন বুদ্ধির সাথে সংযুক্ত করে নিয়ন্ত্রণবাদীদেরকে নিয়ে যায় তাহলে মানুষের কর্মের দায়ভার যে নিতে হবে কেন স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না। নৈতিকতার দায় দেয়ার জন্য স্বাধীন ইচ্ছা অপরিহার্য। আল-গাযালী সেদিক থেকে আত্মাকে স্বতন্ত্র রূপে দেখেন এবং যার গুণাবলী বুদ্ধি (aql), ইচ্ছা (nafs), হৃদয় (kalb) এবং আত্মা (ruh) (Al-Ghazali 1993,vol.3, pp.8-9)। তিনি বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে স্বতন্ত্র করেন যা মানুষকে জ্ঞান অর্জনের ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আর আত্মা ঈশ্বরের প্রদত্ত একটা সত্তা যা জ্ঞান ও ইচ্ছার সহায়তায় নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে। এদিক থেকে স্পিনোজা একটু এগিয়েছিলেন সেখানে তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে এক বলে নৈতিকতা ও যুক্তিনির্ভর জীবনকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর দর্শন কিছুটা বিমূর্ততায় রূপ লাভ করে যেখানে ব্যক্তি মানুষের আবেগ ও নৈতিক দ্বন্দ্ব সমূহ কম স্থান পেয়েছে এবং মানুষের যে দুঃখ কষ্ট রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেগুলো নিয়ে কম আলোচনা পাওয়া যায়। আবার ক্রিশ্চিয়ান ওলফ দার্শনিকতাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো চেষ্টা করেছেন এবং এতটাই পদ্ধতিগত রূপ প্রদান করেছেন যেখানে নৈতিকতার যে সকল জটিলতা গুলো রয়েছে এবং মানুষের আবেগ এই বিষয়গুলো উঠে আসেনি। এক্ষেত্রে তাঁর দর্শন হয়ে উঠেছে নিস্প্রাণ এবং যে সকল মানবিক মূল্যবোধ গুলো আছে সেগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক যদিও তাঁর জ্ঞানতত্ত্বে বলেন, নৈতিক নীতিসমূহ মানুষের সচেতন নৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যা অভিজ্ঞতা, যুক্তি ও সামাজিক নিয়ম থেকে আছে, এজন্য সার্বজনীন নয় (Locke J. 1690/1999, pp. 46-49)। তিনি মনে করেন জ্ঞান এবং নৈতিকতা একে অপরের সাথে জড়িত এবং বিচার এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তবে এটাও ঠিক তার জ্ঞানতত্ত্বে নৈতিক মূল্যবোধের উৎসসমূহ কি সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়নি। তাছাড়া আমাদের কিছু সার্বজনীন নৈতিক নীতি রয়েছে সেগুলো অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে বার্কলি ঈশ্বরকেন্দ্রিক নৈতিকতার কথা বলেছেন যেখানে ঈশ্বর মানুষকে নৈতিকতার পথ দেখান। কারণ তিনি যখন বলেন বস্তু বলতে কিছুই নেই সবই আমাদের মনের চিন্তা তখন বস্তুবাদী মতসমূহ দাঁড়াতে পারে না।

> "That they are of use to mankind, and enable us to draw any general conclusions, is not the result of any immutable habitudes or relations between things themselves, but only of God's goodness and kindness to men in the administration of the world" (Berkeley 1904, p. 93).

অর্থাৎ এই সকল বিষয় মানবজাতির উপকারে আসে এবং আমাদের সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে- এটি বস্তুসমূহের মধ্যে চিরস্থায়ী কোনো স্বভাবগত সম্পর্ক বা অনিবার্য নিয়মের ফল নয়, বরং বিশ্ব পরিচালনায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়ার ফলমাত্র। এই ধারণাটি বার্কলির ঈশ্বরকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্ব ও নৈতিকতার, যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবে দেখা হয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে নয়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। তবে এখানে সমস্যা হলো নৈতিক মূল্যবোধগুলো যদি বাস্তবিক জগতের সাথে সম্পর্ক না রাখে তখন এ দায়বদ্ধতাগুলো চেতনার বিষয় অর্থাৎ ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আপেক্ষিক, এখানে নৈতিক মূল্যবোধের যে সার্বজনীন বা অবজেক্টিভ ভিত্তি আছে সেটাকে অস্বীকার করছে। নৈতিকতা যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলই হয় তাহলে মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের জায়গাটা সীমিত হয়ে যায়। তখন কীভাবে ঈশ্বর মানুষকে পথ দেখান এবং এখানে সমাজের কোন প্রভাব আছে কিনা এ বিষয়গুলো উঠে আসে না। তিনি নৈতিকতাকে ঠিকই গুরুত্ব দেন তবে এটাকে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন আবেগের বিষয় বলে তিনি প্রমাণ করতে চান। এক্ষেত্রে তাঁর নৈতিকতার বিষয়টি আপেক্ষিকতা লাভ করে। একজন নীতি দার্শনিক হিসেবে

পরিচিত কান্ট, তাঁর নৈতিকতা ও জ্ঞানতত্ত্ব পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়, তিনি নৈতিকতার প্রশ্নে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে নেই বরঞ্চ নির্ভর করেছেন মানুষের শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার ওপর, তিনি নৈতিকতাকে একটা সার্বজনীন ভিত্তি দেন যাকে আমাদের যেসকল আবেগ এবং সামাজিক অভ্যাসসমূহ আছে সেটা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন (Thilly 1982, pp. 441-445)। এদিক থেকে তিনি অনেকের থেকে এগিয়ে আছেন তবে এখানে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় যে তাঁর নৈতিক নিয়ম হয়ে যায় অতি বিমূর্ত এবং বাস্তবতা বিবর্জিত যেখানে সব সময় একটা মাত্র নিয়ম দিয়ে জগতের সকল ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যেমন আমরা বাস্তবিক জীবনে অনেক সময়ই নৈতিক দ্বন্দ্বে উপনীত হয়ে থাকি। কান্টের নীতিগুলো বাস্তবতার সাথে একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। সমাজে আমরা যে আচরণগুলো করি সেগুলো অনেকটাই অভ্যাসবশত এবং সামাজিক পরম্পরাসমূহ আমাদের মেনে চলতে হয় এবং সেখানে শুধুমাত্র নীতি মেনে চলা আমাদের জন্য দুরুহ হয়ে যায়। তাই বলা যায় কান্টের নৈতিক সিদ্ধান্ত জনিত যে ব্যাখ্যাগুলো ছিল সেটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও নৈতিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ই সেখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। আর বাস্তবতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু সমাজ গ্রহণ করে না।

তবে কান্টের নৈতিকতার যে ধারণা সম্ভবত বাস্তবজীবনে যে কঠিন সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। বাস্তব জীবনে যুক্তি-তর্ক দিয়ে আমরা যে বিষয়গুলোকে নির্ধারণ করি সেগুলো প্রতিনিয়ত উদ্ভূত হওয়া নৈতিক দ্বন্দ্বসমূহ এড়িয়ে চলতে যথেষ্ট নয়। যেমন কান্টের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলতে হবে এটা একটা নৈতিক নিয়ম হতে পারে। এখন যদি এরকম হয় যে কখনো সত্য বলার জন্য একজন মানুষের জীবন চলে যেতে পারে হতে পারে সে অপরাধী সেখানে কারো জীবন রক্ষা করাও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সত্য বলা এবং জীবন রক্ষা করা দুটি নৈতিক নিয়ম পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। আমি কোনটাকে গ্রহণ করব কোনটাকে ছেড়ে দেব এবং এগুলোর ভিত্তিই বা কি হবে কোনটা থেকে কোনটা অগ্রগামী হবে এ সিদ্ধান্তগুলো কান্টের নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণা আমাদের প্রদান করতে পারে না।

আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব বনাম আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব: জ্ঞান ও নৈতিকতার সম্পর্ক

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা অনেক বেশি প্রেক্ষাপটনির্ভর। আল-গাযালী অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একটা প্রাথমিক স্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেটা বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারেনা বলেছেন। সেদিক থেকে আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক দার্শনিক ডেভিড হিউম জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করেছেন, বুদ্ধি নয় (Thilly 1982, pp.368-370)। যেদিক থেকে দেখা যায় উভয়ই বুদ্ধিকে নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস বলে গ্রহণ করেছেন না। আবার স্যার আল্লামা ইকবাল তাঁর "*The Reconstruction of Islamic Thought*" গ্রন্থে উল্লেখ করেন কান্ট ও আল-গাযালী মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হলো উভয়েই বুদ্ধির বা যুক্তির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেন। তিনি এটাও যুক্ত করেন, আল-গাযালী বিশ্লেষণাত্মক চিন্তায় কোনো আশা না পেয়ে মরমী অভিজ্ঞতার দিকে যান এবং সেখানে ধর্মের একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু খুঁজে পান (Iqbal 1934, pp. 4-5)। স্যার আল্লামা ইকবাল এক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা প্রকাশ করে বলেন, চিন্তাকে সীমিত মনে হলেও এটি যখন পৃথিবীর বিভিন্ন জটিল এবং অপরিচিত বিষয় অনুধাবনের চেষ্টা করে তখন এটি নিজের সীমাবদ্ধতার বাঁধা ভেঙে আরো গভীর জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে পারে। তবে চিন্তা অসীমের আভাস দিলেও মরমী অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে সরাসরি অনুভব করা যায় (Iqbal 1934, pp. 6-19)। এদিক থেকে আল-গাযালীও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির থেকে সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন অতিন্দ্রীয় অনুভূতি বা আত্মিক অনুধ্যানকে, সেটাকে বলা

হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টিমূলক সত্য। এই জায়গাটা আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে অনুপস্থিত থেকে যায় যেখানে আত্মিক বা ঐশী অনুধ্যান আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে কোন উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

আল-গাযালীর দর্শনে আমরা সংশয়বাদ বলে একটা ধারণা পাই যা আমরা ডেকার্টের দর্শনে দেখেছি। নিশ্চিত জ্ঞান পাওয়ার ক্ষেত্রে এই অভিযাত্রায় উভয়ের মধ্যে কিছুটা মিল আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে দুজনের উদ্দেশ্য এক নয়। আল-গাযালী সংশয়বাদের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান দুটোকেই সন্দেহ করে আত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করে এগিয়ে যান এবং পরিশেষে তিনি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান হিসেবে কাশ্‌ফ বা ইলহামের শরণাপন্ন হোন এবং এখানে সমাপ্তি ঘটে। ডেকার্ট সেদিক থেকে বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন নিশ্চিত জ্ঞান পেতে এবং পরিশেষে তিনি সন্ধানও পেয়েছেন তবে সেটা আত্মিক শক্তির বলে নয় বরং যুক্তি তথা বুদ্ধির উপর। এ প্রসঙ্গেই আধুনিক দর্শনের গেটিয়ারের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে তিনি বলেছেন, জ্ঞানকে অনেক ক্ষেত্রে 'যাচাইকৃত বিশ্বাস' বলা হয় কিন্তু যাচাইকৃত হলেও বিশ্বাস জ্ঞান হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, এখানে আরো শর্ত প্রয়োজন। আল-গাযালী বলেছেন, সত্য হচ্ছে তাই যা অন্তর্দৃষ্টি বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং এই ঈশ্বরকর্তৃক প্রাপ্ত জ্ঞান কে আমরা বিভ্রান্তিহীন জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারি। আল-গাযালী যেখানে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে ঐশী জ্ঞানের সন্ধান করা এবং আত্মার উপলব্ধি করা কিন্তু আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বে সেখানে জাগতিক বাস্তবতা বোঝা, প্রযুক্তির সম্পর্কে জানা এবং সমাজ সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা করাই হচ্ছে জ্ঞান চর্চার লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে আল-গাযালীর ক্ষেত্রে জ্ঞানের সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটা ঠিক কি রকম। আমরা বলতে পারি জ্ঞান ও নৈতিকতা একে অপরের সাথে অঙ্গাভঙ্গিভাবে জড়িত যেখানে আধ্যাত্মিকতা তথা আত্মিক বিশুদ্ধতা মানেই নৈতিকতার নামান্তর। যেখানে সত্য জ্ঞান মানেই ধরে নেওয়া হচ্ছে সেটা পরমসত্তার জ্ঞান এবং তাঁর জ্ঞান শুধুমাত্র পবিত্র হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে। এই পবিত্র হৃদয়ের জন্যই দরকার আত্মশুদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধিতাই নৈতিকতার ভিত্তি। আত্মার উন্নয়ন আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে এটা বলা যায় আল-গাযালীর কাছে জ্ঞান ও নৈতিকতা একই সূত্রে গাঁথা, জ্ঞান যেখানে নৈতিকতার ভিত্তি নৈতিকতা সেখানে জ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু এই একই চিত্রটা আধুনিক দর্শনে দেখতে পাওয়া যায় না সেখানে জ্ঞান ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পৃক্ত হতে পারে কিন্তু সেটা ভিত্তি স্বরূপ কাজ করছে বলা যায় না। একে চাইলে জ্ঞানের সাথে জড়িত করা যায় আবার বিভাজনও করা সম্ভব এবং নৈতিক দর্শন বলতে আলাদা শাখা রয়েছে সেখানে বাস্তবতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় কিন্তু এটা জ্ঞান অর্জনের অপরিহার্য শাখা নয়। আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব নীতি-আধ্যাত্মিক কাঠামোর উপর নির্মিত বলা যায় যেখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জন করা প্রয়োজন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন সেক্ষেত্রে যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা।

বর্তমান সমাজে নীতি-ভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান বিশ্ব একটা চরম সংকটাপন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে যেখানে পরিবেশগত বিপর্যয় তো রয়েছেই তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তিগত অবক্ষয়, তথ্যের অপব্যবহার, সামাজিক বৈষম্য এবং নৈতিক অধঃপতন। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নৈতিকতা সমৃদ্ধ জ্ঞানানুশীলন অনেক জরুরী হয়ে পড়েছে যেখানে নৈতিক জ্ঞান কী, নৈতিক জ্ঞানের ভিত্তি কী, এটি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা ও এর ভূমিকা এই বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আমরা বর্তমানে অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গিয়েছি এবং এটি আমাদের জ্ঞানের পরিসরকে বৃহৎ করছে কিন্তু এখানে মূল্যবোধের প্রশ্নটা থেকেই যায়। তাছাড়া সামাজিক

ক্ষেত্রেও ভুল তথ্যের প্রচার ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান এগুলো সব সময়ই নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বর্তমানে জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের অনুসরণ করা হচ্ছে যেখানে ব্যক্তিগত মতামত মানে নৈতিকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানে নীতিভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্ব প্রশ্ন করে সত্যিই কি আমার ব্যক্তিগত মতই সবসময় ন্যায়সঙ্গত? জ্ঞানের ও নৈতিকতার কি কোনো অবজেক্টিভ দিক থাকবে না? এক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বোধের মানদন্ড ঠিক কীরকম হবে সেটা নির্ধারণ করাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে সংযোগ করার কথা সমকালীন সময়ে বহুল আলোচিত বিষয়। একে সামনে আনতে নৈতিক জ্ঞানতত্ত্ব (Moral Epistemology) বলে একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে। রবার্ট অডি (Robert Audi) একজন নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বিক, যিনি জ্ঞান হতে গেলে কি কি শর্ত থাকতে হবে সে বিষয় পুনর্বিবেচনায় মনোযোগ দেন। পূর্ববর্তীতে দেখেছি গেটিয়ার কিভাবে জ্ঞান হওয়ার জন্য আরো কিছু শর্ত যুক্ত করার কথা বললেন, অডি সত্যের শর্তের ক্ষেত্রে এসে কিছুটা নমনীয় ভূমিকা পালন করলেন। নির্ভরযোগ্যতা তত্ত্ব (Reliability) মনে করে জ্ঞান হওয়ার জন্য যাচাইকরণ মূখ্য বিষয় নয় বরং আমি কোন প্রক্রিয়া থেকে সেটা জেনেছি সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হতে পারে আমি কোন অ্যাপের মাধ্যমে মাধ্যমে কোন বিষয়ে একটা তথ্য জানতে পেরেছি, সেক্ষেত্রে তথ্যটি যাচাই করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সেটা কোন নির্ভরযোগ্য থেকে জানতে পেরেছি এবং সূত্রটি নির্ভরযোগ্য হলেই তথ্যটি জ্ঞান হওয়ায় যোগ্যতা রাখে, এখানে যাচাই করার প্রয়োজন নেই (Audi 1998, p. 225)। এই নির্ভরযোগ্যতা তত্ত্ব দিয়ে রবর্টি অডি JTB ধারণাটিকে আরো বেশি সুসংহত করতে চেয়েছেন। নির্ভরযোগ্যতা তত্ত্ব যখন বলে সত্যের ক্ষেত্রে জাস্টিফিকেশন বা যুক্তিসঙ্গত হওয়া মূখ্য নয় শুধুমাত্র সত্য বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য সূত্রই যথেষ্ট সেখানে রবার্ট অডি এ প্রসঙ্গে বলেন, ''আমরা বলতে পারি যে জ্ঞান হলো সত্য বিশ্বাস, যা সঠিক প্রকারের ভিত্তির উপর এবং সঠিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত" (Audi 1998, p. 239)। অর্থাৎ সত্যের ক্ষেত্রে যাচাইকরণ বা ন্যায্যতার প্রয়োজন রয়েছে তবে তিনি বলেন যুক্তিসঙ্গত সত্য বিশ্বাসের জন্য যেটা প্রয়োজন সঠিক ভিত্তি আর সেটা হতে হবে পরীক্ষামূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক (Audi 1998, p. 240)। তখনই জ্ঞান নৈতিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

অডির নৈতিক জ্ঞানতত্ত্বের সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও সমকালীন সময়ে বহুল আলোচিত। আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্বকে নৈতিক জ্ঞানতত্ত্ব বলা না হলেও নীতিসমৃদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব এর সাথেও এক্ষেত্রে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে তিনিও জ্ঞানের সঠিক উৎসের সন্ধান করেছিলেন এবং এর সাথে নৈতিকতা যুক্ত করেছিলেন। তবে দুজনের পদ্ধতি আলাদা। অডি যেখানে বিশ্লেষণী ভিত্তিতে সত্য জ্ঞান পাওয়ার জন্য পরীক্ষালব্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, সেখানে ইমাম আল-গাযালী নির্ভর করেন অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির উপর। রবার্ট অডি যেখানে জ্ঞানতত্ত্ব ও নৈতিকতা এ দুটো আলাদা শাখাকে যুক্তির মাধ্যমে একত্রিত করার চেষ্টা করেন সেখানে আল-গাযালি নৈতিকতাকে জ্ঞানের কেন্দ্রে স্থাপন করেন। তাঁর কাছে নৈতিকতা হলো জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য ও অভ্যন্তরীণ ভিত্তি। সে দিক থেকে তুলনামূলক ভাবে আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্বে আত্মিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতার জায়গা অনেক বেশি স্পষ্ট।

বর্তমান সময়ের নৈতিক সংকটগুলোকে যদি আমরা বিবেচনায় নেই তাহলে নৈতিকতা-নির্ভর জ্ঞানতত্ত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা বলতে পারি জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তি নয় বরং আত্মিক বিশুদ্ধতা অনেক বেশি জরুরী। জ্ঞান অর্জনের জন্য সত্যিকার অর্থেই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশীলতা। আল-গাযালীর আলোকে বলা যায়, জ্ঞান সেটাই যা শুধুমাত্র বাহ্যিক তথ্যবহুলতা বা অনেক বেশি নিজেকে জাহির করা নয় বরং আত্মার শুদ্ধতার মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করা। আর এ সত্যকে তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন মানুষের নৈতিকতার জ্ঞান অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে। অন্তরের পরিশুদ্ধতা ছাড়া আর যাই হোক সত্যিকারের জ্ঞান কখনো অর্জন করা সম্ভব না আর যা সত্যিকারের জ্ঞান নয় তা কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। এ কারণে অন্তরের পবিত্রতা জ্ঞানের প্রধান উৎস এবং

শর্ত হওয়া উচিত। তাই আল-গাযালী কাশ্‌ফের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করার কথা বলেছেন সেটা শুধুমাত্র যুক্তি ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতাকে ছেড়ে যাওয়ার মাধ্যমে সম্ভব হবে। জ্ঞান এক ধরণের আলো যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরের উদ্ভাসিত হয় । তাঁর মতে, ''আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং চূড়ান্ত নূর: এবং তদুপরি, যখন প্রতিটি স্তরের সাথে সম্পর্কিত বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়, তখন প্রকাশ পায় যে আল্লাহ একাই বাস্তব, সত্য নূর, এবং তাঁর বাইরে আর কোনো নূর নেই" (Ghazali 1924, p.79)।

আল-গাযালীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে তাঁর কাছে জ্ঞান হচ্ছে সেটাই যেটা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং এর পবিত্রতা সমাজ ও রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে অন্তরের সাথে শিক্ষার যে সম্পর্ক সেটা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আল-গাযালীর দর্শন আমাদের মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা অর্জনের দিকে ধাবিত করে। তাঁকে অনুসরণ কওে বলা যায়, যে জ্ঞান ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতি করে সেটাকে কখনোই জ্ঞান বলা যায় না।

উপসংহার

আল-গাযালীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারি জ্ঞানচর্চায় নৈতিকতার সংযোজন কতোটা আবশ্যক । আধুনিক সময়ে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবোধগত যে অবক্ষয় তা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আর এক্ষেত্রে মানসিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য আল-গাযালীর জ্ঞানতত্ত্ব একটা আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে যেখানে জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে সর্বত্র কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে নীতিশুন্য হয়ে যাচ্ছে এবং জ্ঞানের সাথে নৈতিকতার একটা দূরত্ব সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে, তাঁর নৈতিক ভিত্তিসম্পন্ন সমন্বিত জ্ঞানতত্ত্ব (holistic epistemology with moral basis) আমাদের জন্য একটা আদর্শ হতে পারে এবং জ্ঞানগত উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হবে যা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব ফেলবে। এতে আমাদের যে মনোগত পরিবর্তন সাধিত হবে সেটা একই সাথে সমাজকল্যাণেও নিয়োজিত হওয়ার পাথেয় হিসেবে কাজ করবে এবং তা মানুষকে শুধুমাত্র কিভাবে একজনকে দক্ষ কর্মী ও নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি গুরুত্ব দেবে আত্মসচেতন ও নৈতিক বোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল একজন নাগরিক গঠন করতে। জ্ঞান চর্চাকে যদি নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত না করা যায় তাহলে আমরা মানবিক ও আত্ম-উপলব্ধি সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো না। তাই যে ধরণের শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, হোক সেটা ধর্মীয় বা বিজ্ঞান কিংবা নিরেট কারিগরি শিক্ষা, সেখানে কেবল পেশাগত সফলতা, অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা সামাজিক পদমর্যাদা নয় বরং অন্তর্দৃষ্টি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হবে। আল-গাযালীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি যে, শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর না হয়ে যুক্তির ও বিশুদ্ধতার ধারণার সংমিশ্রণ ও আত্মিক অনুভূতির চর্চার মাধ্যমে এমন একটি নৈতিক জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে আলোহীন আধুনিকতা নয় বরং আমাদের জ্ঞান হবে একটা আলোকবর্তিকা, যেটা সমাজের সকল ধরণের বৈষম্য এবং অসামঞ্জস্যতাকে দূর করে দিবে।

তথ্যসূত্র

Al-Ghazali. (1963). *Tahafut al-Falasifah [Incoherence of the philosophers]* (S. A. Kamali, Trans.). Pakistan Philosophical Congress.

Al-Ghazali. (1980). *Deliverance from error (al-Munqidh min al-Dalal)* (R. J. McCarthy, Trans.). Twayne Publishers. (Original work published in 1111)

Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulum al-Din* (F. Karim, Trans., Vol. 1, p. 9). Darul-Ishaat.

Al-Ghazali. (1993). *Ihya Ulum al-Din* (F. Karim, Trans., Vol. 3, p. 9). Darul-Ishaat.

Audi, R. (1998). *Epistemology: A contemporary introduction to the theory of knowledge* (1st ed.). Routledge

Berkeley, G. (1904). *A treatise concerning the principles of human knowledge* (Reprint ed.). The Open Court Publishing Company.

Cooper, J. M. (1990). *Plato's Theaetetus*. New York & London: Garland Publishing. (Harvard Dissertations in Philosophy).

Descartes, R. (2008). *Discourse on the method of rightly conducting one's reason and of seeking truth in the sciences* (J. Veitch, Trans.). Project Gutenberg. https://www.gutenberg.org/ebooks/59 (Original work published 1637)

Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press

Gettier, E. L. (1963). *Is Justified True Belief Knowledge?* Analysis, 23(6), 121–123. https://doi.org/10.2307/3326922

Ghazali, A. (1924). *The Mishkat al-Anwar (The Niche for Lights)* (W. H. T. Gairdner, Trans.). Royal Asiatic Society.

Iqbal, M. (1934). *The reconstruction of religious thought in Islam*. London: Oxford University Press.

Locke, J. (1690/1999). *An essay concerning human understanding* (J. Manis, Ed.). The Pennsylvania State University, https://www.philotextes.info/spip/IMG/pdf/essay_concerning_human_understanding.pdf

Mustafa, K. (2003). *Al-Ghazali's theory of knowledge* (1st ed.). Dhaka: Ramon Publishers.

Nakamura, K. (1994). Imām Ghazālī's Cosmology Reconsidered with Special Reference to the Concept of "Jabarūt", *Studia Islamica, 80*, 29–46. Maisonneuve & Larose. http://www.jstor.org/stable/1595850

Thilly, F. (n.d.). *A history of philosophy* (L. Wood, Rev.). Allahabad, India: Central Book Depot.

ড. আমিনুল ইসলাম। (২০১৯)। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (৭ম মুদ্রণ). ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।